খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 22 16 May 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যা ১৬ মে ২০১৩ বৃহস্পতিবার ২ টাকা

প্রকাশিত হচ্ছে পুস্তিকা

ওপারে শাহবাগ এপারে আমরা

অগ্রিম অর্ডারের জন্য সত্বর যোগাযোগ
৮০১৭৯৫৪১২৬ (বাবলা, আহ্বায়ক,
শাহবাগ সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ)

•গরম ও হাওয়া পৃ ২ •চিট ও শিল্পায়ন পৃ ৩ •মানবিকতা পৃ ৩ •ঝিলরক্ষা পৃ ৩ •পস্কো পৃ ৩ •সর্পদংশন পৃ ৩ •বেশে কালী পৃ ৪ •হেফাজত পৃ ৪

বসুন্ধরা পরিবার : গ্রামবাংলার চাষবাস নির্ভর জীবনের স্ব-উদ্যোগে এক অন্য স্বল্প-সঞ্চয়ের গল্প

সুব্রত পোদ্দার, মেমারি, বর্ধমান, ১৩ মে •

বর্ধমান জেলা যতই ধান চাষে সমৃদ্ধ হোক না কেন, আমাদের ওখানকার ব্যাপক অংশের উপার্জন খুব সামান্য। এরা আদিবাসী মানে সাঁওতাল, এছাড়া আছে দুলে, বাগদি, হাঁড়ি ইত্যাদি সম্প্রদায়। গ্রামের ৫৫-৬০ শতাংশ মানুষ এই তথাকথিত নিচু জাতের মধ্যে রয়েছে। বাকি ৪০-৪৫ শতাংশের মধ্যে যারা লেখাপড়া শিখে একটু উন্নত হয়েছে, তারা গ্রামের বাড়িতে থাকে না। একশো দিনের কর্মপ্রকল্প চালু হওয়ার পর আমাদের পঞ্চায়েত গর্ব করে, গড়ে আমরা সাড়ে চৌত্রিশ দিনের কাজ দিয়েছি। বাস্তব চিত্র কিন্তু পুরোপুরি তা নয়, এটা দেখানো হয়। আমাদের ওখানে সব তিনফসলি জমি। তিনটে সিজনে এই মানুষেরা কাজ করে। তাদের নিজস্ব জমি কিছু নেই। কেউ কেউ বর্গায় দু-চার ছটাক পেয়েছে। ও দিয়ে পেট চলে না। তিনখানা সিজনে — রোয়া এবং কাটা মিলে — দশ দশ কুড়িদিন করে কাজ, অবশ্য যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে পারবে তার। তাহলে বছরে মোট ষাটদিন মাঠের কাজ আর চৌত্রিশ দিন একশো দিনের প্রকল্পে, সারা বছরে মোট চুরানব্বই দিনের কাজ, সেটা না হয় বাড়িয়ে একশো ধরা হল। একশো দিনের প্রকল্পে রেট ১৫১ টাকা, চৌত্রিশ দিনের জন্য আর বাকি ছেষট্টি দিনের মাঠের কাজে রেট ১৩০ টাকা। একশো দিনের কাজে পরিবার পিছু একটাই জবকার্ড। তাহলে সারা বছরের আয় দাঁড়াচ্ছে ১৩,৭১৪ টাকা। আমরা যখন ২০০৩ সালের শেষের দিকে কাজটা শুরু করেছিলাম, তখন ছবিটা এর থেকেও খারাপ ছিল। একটা পরিবারের সদস্য কমপক্ষে চারজন, বেশি হলে ছ-সাতজনও হতে পারে। ৩৬৫ দিনই খেতে হবে, হিসেব মতো দৈনিক আয় দাঁড়ায় ৩৭ টাকা ৫৭ পয়সা। আয়টা বাস্তবে আর একটু বেশিই হয়। কারণ এই লেবার শ্রেণীর ঘরে স্বামী স্ত্রী দুজনেই খাটতে যায়। একশো দিনের কাজ দুজনে না পেলেও মাঠের কাজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই আয়ে কীভাবে খাওয়া চলবে?

আমরা দেখেছি, তারা সজনে পাতা সেদ্ধ করে খায়। সাঁওতাল মানুষের খাদ্যাভাসে ডাল নেই। ডাল যখন সস্তা ছিল, তখনও ওদের ঘরে ডাল ঢুকত না। কখনো-সখনো মাছ চুরি করে আনলে মাছ পড়বে পাতে। অন্যান্য সবজি বাজার থেকে কেনার প্রশ্নই নেই। বনে-বাদাড়ে কুড়িয়ে বা চুরি করে যেটুকু মেলে সবজি খাওয়া সেটুকুই। এইরকম অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমার ভাইয়ের বন্ধু, আমার বন্ধু যেসব সাঁওতাল ছেলেপিলে বলত, তুই টাউনে আছিস, এখানে চলে আয়, একটা কিছু সবাই মিলে করি, মানুষজন খেতে পাচ্ছে না। ঘটনাচক্রে আমার দুই ভাই মারা গেছে, ফলে আমার বাবা-মায়ের কাছে থাকার দরকারও হয়ে পড়েছিল। এরাও ডাকছিল। আমি গ্রামে ফিরে গেলাম। কয়েকমাস ধরে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে আলোচনা করেছি, কী করা যায়? তারপর একটা গ্রুপ তৈরি করে বিডিও অফিসে, পঞ্চায়েতে বারবার গেলাম। আমরা বারবার চেষ্টা করেছি কো-অপারেটিভ আইনে আমাদের সংস্থাকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে। তাহলে আমরা সরকারের কাছ থেকে কিছু কাজকর্ম পাব। কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারব। তিন ধরনের বাই-লজ কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গেছি। আড়াই বছর ঘুরে সিআই সাহেব শুভ্রজ্যোতি বাবু বললেন, 'ভাই তুমি ভুল বুঝো না। তোমরা যেভাবে পারো কিছু করো। কিন্তু আমি কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দিতে পারছি না।' তিনি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কারণটা ছিল অন্য কিছু।

এরপর আমরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলোতে ভিজিট করতে শুরু করি। সকলেই 'শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক'-এর কথা জানে। এশিয়ার মধ্যে প্রথম সারির কো-অপারেটিভের মর্যাদা পেয়েছিল। এখন অবশ্য তেমন গ্রোথ নেই। যা অ্যাসেট আছে তাতে চলে যাচ্ছে। আমাদের গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে এই কো-অপারেটিভ। এসব জায়গায় ভিজিট করলাম। বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জনবাবুর কাছেও পৌঁছেছিলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কীভাবে আপনাদের এই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ফর্মেশনটা হয়েছিল? উনি বললেন, 'তখনকার দিনে তো সেলফ হেল্প গ্রুপ ছিল না। কিন্তু ওইধরনের গ্রুপ করেছিলাম। তারপর যখন আইন হল, আইনি স্বীকৃতি পেয়ে গেলাম।'

আমাদের শিক্ষা নিকেতন চলছিল ২০০৪ সাল থেকে। কম্পিউটার এডুকেশন শুরু হল ২০০৫ সালে। তারপর কম্পিউটার সারাই করা, বানানো শিখলাম। এইসব করতে করতে যখন দেখলাম, সবই করছি, কিন্তু পুঁজি না হলে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাঙ্কের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ফিরে এসেছি। কো-ল্যাটারাল সিকিউরিটি ছাড়া কোনো গভর্নমেন্ট প্রজেক্টে ব্যাঙ্ক ফিনান্স করেনি। আমরা আমদের সমস্ত সার্টিফিকেট জমা রাখতে চেয়েছিলাম ব্যাঙ্কের কাছে। কিন্তু সেগুলোর কোনো মূল্যই ওদের কাছে ছিল না। আমাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল, ব্যাঙ্ক টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা করতে বসেছে। তোমরা সমাজসেবা করোগা। ততদিনে আমাদের সঙ্গে যারা জড়ো হয়েছিল, অনেকে ছেড়ে চলে গেল।

এরপর দুয়ের পাতায়

মানি মার্কেটে ব্যবসা লাটে

এমপিএস দহিজুড়ির কৃষিফার্ম ও রিসর্ট শ্রমিকদের ওপর কোপ

অমিত মাহাত, ঝাড়গ্রাম, ১৫ মে •

যখন গোটা রাজ্য জুড়ে সারদা মানি মার্কেট বিজনেস নিয়ে যায় যায় আওয়াজ উঠছে, তখনও বেশ চলছিল ঝাড়গ্রামের এমপিএস-এর কাজকর্ম। পাশা উল্টে গেল পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদায় অবস্থিত এমপিএস গ্রিনারি ডেভেলপার্স নামে চিটফান্ড সংস্থার অফিসে আমানতকারী জনতার বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনায়। ওই ঘটনার জেরে এমপিএস-এর কলকাতার অফিসে তালা পড়ে। এখন অর্থভাণ্ডারে টান পড়ায় ঝাড়গ্রামের দহিজুড়িতে অবস্থিত এমপিএসের কাজও বন্ধের দিকে।

গত ৭ মে রাত্রিবেলা এমপিএস-এর পাততাড়ি গোটানোর চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে। এমপিএস-এর দহিজুড়ি ফার্ম থেকে গবাদি পশু রাতের অন্ধকারে পাচার করে দেওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় যারা দহিজুড়ি সংলগ্ন এমপিএস-এর কর্মী, ওদেরই একটা অংশ বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য গবাদি পশু বোঝাই গাড়িটি আটক করে। পরের দিন সকালে কাজ করতে আসা হাজার খানেক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের খবর শোনে। কাজ হারানোর জেরে এমপিএস রিসর্ট গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা।

এমপিএস-এর এই ফার্মে মোট তিন শ্রেণীর শ্রমিক কাজ করে। ক্যাটাগরি এ, বি ও অস্থায়ী শ্রমিক। এ ও বি ক্যাটাগরি মিলে মোট ছশো জন এবং অস্থায়ীভাবে মাঠে কাজ করা শ্রমিকের সংখ্যা চার-পাঁচশো জন। এছাড়াও রয়েছে ঠিকাদারদের শ্রমিক।

কেবল ছাঁটাই হওয়া বা কাজ হারানো নয়, শ্রমিকদের বেতনও কমিয়ে দৈনিক ষাট টাকা করা হয়েছে। অনেক শ্রমিক কাজ ধরে রাখার জন্য এই ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্যের বাজারে মাত্র ষাট টাকাতে কাজ করতে রাজি হয়েছে।

কথা বলছিলাম বিনপুরের আঁধারিয়ায় বাড়ি অনন্ত বাগরাই-এর সাথে। ছাঁটাই হয়ে গেছে সে। কাজ হারানোর কষ্ট ওর চোখেমুখে স্পষ্ট। কথার মধ্যেও কাজ হারানোর ক্ষোভ। 'কী যে হবেক বুঝতে পারছি লাই। এখানে তবু মাটি কাইটে খাইতাম। ইবার সিটাও গেল।' অর্থাৎ মাথায় হাত পড়ে গেছে। ঝাড়গ্রামে বাড়ি দীপালি মাঝি-র। স্বামীর মতোই নিজেও সংসারে একটু বাড়তি সুরাহার জন্য এমপিএস-এ কাজ নিয়েছিলেন। মজুরি কমে গেছে তাঁর। এখন সামান্য মজুরিতে কীভাবে চলবে, দীর্ঘশ্বাসের মতোই এ প্রশ্নটা বেরিয়ে এল তাঁর মুখ দিয়ে।

এখানকার স্থায়ী বি ক্যাটাগরির কর্মী সিনরাই টুডু। ওঁর সাথে কথা বলে জানা গেল, ওদের দৈনিক বেতন ১৬৫ টাকা হলেও এখন মাসিক হাজার টাকা হিসেবে আরও তিন মাস ধরেই এই কাজটা করতে হবে। ফলে দেনার মধ্যে চলছে গোটা পরিবার। এইভাবে টানা আরও তিনমাস — কিন্তু তারপরে কী হবে তার উত্তর পাওয়া গেল না এমপিএস চত্বরের কোনো কর্মীর মুখেই।

আরও জানা গেল, এমপিএস-এর বেশিরভাগ কাজই বন্ধ। নতুন কনস্ট্রাকশনের জন্য সাত জন ঠিকাদারের মধ্যে এখন মাত্র তিনজন ঠিকাদার কাজ করছে। আর মাটি কাটার কাজে ডেলি লেবার যারা আসত, তারা দু-দিনে একদিন কাজ পাচ্ছে এখন।

কোর্টের রায় নয়, জনতার রায় মেনে চলব : উদয়কুমার

কুডানকুলাম পরমাণু প্রকল্পের কমিশনিং চালিয়ে যেতে বলল সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ১৫ মে •

কুডানকুলাম পরমাণু কেন্দ্র কমিশনিং-এ স্থগিতাদেশ চেয়ে করা একটি আবেদন ৬ মে সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ নাকচ করে দিয়েছে। রায়ে আন্তর্জাতিক পরমাণু এজেন্সির একটি নথি উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার, তাই কুডানকুলাম পরমাণু কেন্দ্রের কমিশনিং প্রয়োজন।

বস্তুত রায়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবর্ষের পরমাণু লবি এবং সরকারের তরফে বলে আসা হচ্ছে। এই রায়ে কুদানকুলাম পরমাণু প্রকল্প সম্পর্কে প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ এবং অসুবিধা ও তেজস্ক্রিয় দূষণকে কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থের তুলনায় ছোটোখাটো ব্যাপার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুডানকুলামের পরমাণু বিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র এসপি উদয়কুমার এ প্রসঙ্গে মিডিয়াকে জানিয়েছেন, 'আমরা 'পরমাণু শক্তি বিরোধী জন আন্দোলন' কোর্টে এই আবেদন করিনি, করেছে 'পুভুলাগিন নানবারগাল' নামে চেন্নাই-এর একটি পরিবেশ সংগঠন। আমরা কোর্টের রায় মেনে চলব না, জনতার রায় মেনে চলব।'

এইদিনই ইদিনথাকারাইয়ে পরমাণু বিরোধী মঞ্চে লড়াই জারি রাখার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। ইদিনথাকারাইয়ের বাসিন্দা, আন্দোলনের নেত্রী সুন্দরী জানিয়েছেন, 'আমরা গত ৬৩০ দিন ধরে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছি, সরকার বা কোর্টকে আমাদের পাশে পাব এই আশার ওপর দাঁড়িয়ে নেই। আমরা পরমাণু প্রকল্পের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই বন্ধ করে দিতে পারি না। কোর্ট আমাদের মানুষজনের একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি। পরমাণু দায়বদ্ধতা বিষয়ে আমাদের সওয়ালের, বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মহড়া সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়নি আদালত। আমাদের কাছে সরকার এবং আদালত একই — যারা অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য পরমাণু বিদ্যুৎ প্রোমোট করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, পরমাণু শক্তি আমাদের মুছে দেবে, আমাদের জীবিকা মুছে দেবে।'

তবে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে কুডানকুলামের কমিশনিং প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে বলা হলেও ১৫টি নির্দেশ জারি করা হয়েছে, সেগুলি হল : যন্ত্রাংশের গুণমান সহ সমস্ত দিক বিবেচনা করে NPCIL, DAE, AERB এর ছাড়পত্র না মিললে চুল্লি চালু করা যাবে না; কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক তার ছাড়পত্রের শর্তগুলি পালন করা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখে তবে চুল্লি চালু করতে দেবে; চালু হওয়ার পরও প্রতি তিনমাসে অন্তত একবার প্রকল্পের নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখবে ও ঠিকঠাক করার বন্দোবস্ত করবে AERB ও NPCIL. চুল্লির তেজস্ক্রিয় পোড়া জ্বালানি থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে পর্যাপ্ত নজরদারির বন্দোবস্ত করতে হবে; প্রকল্পের মধ্যে নয়, পোড়া জ্বালানি ফেলার স্থায়ী জায়গা হিসেবে দ্রুত কোনো গভীর ভূতাত্ত্বিক গহ্বর-এর (Deep Geological Reserve) বন্দোবস্ত করতে হবে; বিপর্যয় মোকাবিলায় সময়ে সময়ে জরুরি মহড়ার আয়োজন করতে হবে ও পুলিশ-প্রশাসন-দমকল-ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে; প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের ওপর থেকে সমস্ত অপরাধ মামলা তুলে নিতে হবে প্রভৃতি।

কমিশনিং প্রক্রিয়া জারি রাখার রায়ের বিরোধিতা করলেও পরমাণু প্রতিরোধ আন্দোলনকারীরা সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশগুলিকে স্বাগত জানিয়েছে।

এদিকে ফের একবার কুডানকুলাম চুল্লির কমিশনিং-এর সময়সীমা পিছিয়ে দিল এনপিসিআইএল। এপ্রিলে কমিশনিং না করতে পারার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণস্বামী জানিয়েছিলেন, মে মাসে কমিশনিং হবে। ১৫ মে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তা পরের মাসে হবে বলে জানায় পরমাণু কর্তৃপক্ষ।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ১৪ মে মাছ ধরা বয়কট করে কালো পতাকা নিয়ে ব্যাপক গণবিক্ষোভে ইদিনথাকারাই, তুতিকোরিন, কুত্তাপুলি-র মৎস্যজীবীরা।

...সাত-এর ...দনির মৃতার মা

...মরা চাকরি, ক্ষতিপূরণ কিছু... না। নেতামন্ত্রীরা কি আমাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন? আমরা শুধু মেয়ের খুনির ফাঁসি চাই

কবি শঙ্খ ঘোষ

... যে কোনও দুর্যোগের পরই ... যেমন ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে, বারাসতে মেয়েটির নির্মম পরিণতির পর সেটাই করা হয়েছে। এর চেয়ে আপত্তিকর কিছু হতে পারে না। বারাসতের যে প্রতিবাদী মানুষেরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার প্রণতি রইল।

সুপ্রিম কোর্টের তোতাকাহিনি

- *পরমাণু প্রতিষ্ঠানগুলি, যথা অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন* **(AEC),** *এবং অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের* **(AERB)** *বক্তব্যকে শেষ কথা বলে ধরে নিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের দীপক মিশ্র এবং কে এস রাধাকৃষ্ণনের বেঞ্চ।*
- *পরমাণু লবির দাবি, 'পরমাণু শক্তি পরিষ্কার, নিরাপদ, নির্ভরশীল এবং সস্তা' — এই দাবিগুলি বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছে এবং এর পক্ষে সওয়াল করেছে কোর্ট।*
- *ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি, যা একটি পরমাণু প্রতিষ্ঠান এবং যা নিজের অস্তিত্বের খাতিরেই পরমাণু শক্তির সোনালি ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে দায়বদ্ধ, তাদের ২০০৮ সালের দাবির ওপর ভিত্তি করে, 'ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য ২০৫০ সালের মধ্যে তিনগুণ পরমাণু বিদ্যুৎ প্রয়োজন' — এর পক্ষে সওয়াল করেছে কোর্ট।*
- *কুডানকুলামে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা মহড়া না করেই কমিশনিং করা হচ্ছে, পরমাণু প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদেরই চালু করা এই আইন অমান্য করা হচ্ছে কুডানকুলামে, সে বিষয়ে রায়ে উল্লেখ নেই।*
- *পরমাণু প্রতিষ্ঠানগুলির নিজেদের তৈরি করা আইনেই আছে, প্রকল্পের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে কোনো জনবসতি থাকতে পারবে না। কিন্তু কুডানকুলামের ৭০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে সুনামি কলোনি — এই বেআইনি বিষয় নিয়ে কোনো উল্লেখ নেই রায়ে।*
- *এইআরবি-র সেফটি কোডটি ১২ পাতা জুড়ে ব্যাখ্যা করেছে রায়।*
- *রায়ে ভারত যাতে পরমাণু-বিচ্ছিন্ন দেশ না হয়ে পড়ে, তার সাবধানবানী শোনানো আছে। বস্তুত, পৃথিবীর হাতে গোনা কয়েকটি দেশ ছাড়া বাকিরা পরমাণু-বিচ্ছিন্ন। ফুকুশিমা বিপর্যইয়ের পর অন্তত পাঁচটি দেশ সচেতনভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।*
- *কোস্টাল রেগুলেশন জোন আইন যে ভাঙা হয়েছে কুডানকুলামে, তার কোনো উল্লেখ নেই রায়ে — বরং এই আইন ভাঙাকে কোর্টের সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।*
- *তেজস্ক্রিয় পোড়া জ্বালানি ফেলার স্থায়ী নিরাপদ জায়গা পাঁচ বছরের মধ্যে খুঁজে ফেলার এনপিসিআইএল-এর আশ্বাসে সায় দিয়েছে কোর্ট। অথচ, পরমাণু শক্তির পৌনে একশো বছরের ইতিহাসে বিশ্বের কোনো দেশ পোড়া জ্বালানির স্থায়ী নিরাপদ ঠিকানা খুঁজে পায়নি এখনও।*

সম্পাদকের কথা

মানি মার্কেটের নেপথ্য

চেনাজানা লোকেদের কাছ থেকে 'ইনভেস্ট' করার আহ্বান শুনতে হচ্ছিল বেশ কয়েকবছর ধরেই। বিশেষত, যাদেরই কোনো চাকরি আছে, এমনকী সঞ্চয় করার মতো রোজগার আছে, তার কাছে পড়ে যেত বিভিন্ন মানি মার্কেট কোম্পানির এজেন্ট, পরিচিতজনেরা। কেউ ভাইয়ের বন্ধু, কেউ বা আবার সরাসরি আত্মীয়। বেশি লাভ করবার আশার সাথে মিলেমিশে বিশ্বাস, সম্পর্ক — এক জবর খেলার জন্ম দিয়েছিল — যে খেলায় সবপক্ষই জেতে। এরকমই সোনালী ছিল এতদিন, প্রায় দশ বারো বছর ধরে চলা এই বাংলার মানি মার্কেট। স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল অস্বাভাবিক রিটার্ন।

সরকারের উন্নয়ন-শিল্পায়নের বাঁধা বুলির বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল এরা। লোকের আমানত পুঁজি নিয়ে রিয়েল এস্টেট থেকে পশু খামার, শপিং মল থেকে আইটি, ট্যুরিজম থেকে অ্যাগ্রো, সিনেমা থেকে মিডিয়া — কী নয়। সিবিআই-কে লেখা চিঠিতে সারদা গ্রুপের কর্ণধার তো বুক বাজিয়ে বলেই দিয়েছেন, 'এসবই করেছি কোনো ব্যাঙ্ক থেকে কোনো লোন না নিয়ে'। এই তো উন্নয়নের তেজি ষাঁড়ের কায়দা!

২০০৮ সালে রিলায়েন্স পাওয়ারের শেয়ার কেনার হিড়িকের কথাটা শিক্ষিত লোকে নিশ্চয় ভুলে যায়নি। শেয়ার 'ওপেন' হওয়ার চারদিন আগে থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, দেশের কোনো কোর্ট যদি স্থগিতাদেশও দিয়ে দেয় এই শেয়ার (আইপিও) প্রকাশের ওপর, তা গ্রাহ্য হবে না। 'ওপেন' হওয়ার দিন প্রথম মিনিটে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা তুলেছিল কোম্পানি, ছ-টা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানানোর কথা দিয়ে। একমাস পরেই গল্পটা তেতো হয়ে যায়, শেয়ারটি বাজারে আসে সতেরো শতাংশ কম দামে। লক্ষ লক্ষ ছোটো আমানতকারী মুহূর্তের মধ্যে লুটে যায়। প্রমাণ নেই, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলে সবাই মানে, রিলায়েন্স জেনেশুনেই কাণ্ডটা ঘটিয়েছিল, আজেবাজে প্রচার করিয়ে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে প্রকাশ করেছিল।

এবারেও এখন আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে, এই 'শিল্পায়ন'-এর বেশির ভাগটাই ভাঁওতা। স্রেফ জমি কিনে, তাই দেখিয়ে টাকা তোলার ধান্দা। করব বলে ঠেকিয়ে রাখা। কেউ কেউ অবশ্য শিল্পায়নের আহ্বানেরও পরোয়া করে না। তারা পণ্যের ফাটকা বাজারে আমানত খাটিয়ে চড়া সুদ দিচ্ছে গ্রাহকদের। বেশি লাভ করা গ্রাহকরা সহ সমস্ত মানুষ ওই পণ্যের ফাটকা বাজারের প্রত্যক্ষ কুফল — জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ভোগ করছে। সামাজিকতাকে ব্যবহার করে বেশি লাভের কু-চক্র সমাজের ভেতরে আসন গেঁড়ে বসছে। তাতে কী? অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, তা সে যার মাধ্যমেই আসুক, শিল্পায়ন বা ফাটকায়ন।

মানি মার্কেটের জন্য কড়া আইন আনছে রাজ্য, কেন্দ্র সরকার। চোর পালালে বুদ্ধি বেড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু কড়া আইন বানিয়ে কি তেজি ষাঁড়ের গলায় দড়ি পরানো যায়? ওই ষাঁড়ই তো আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি!

প্রথম পাতার পর বসুন্ধরা পরিবার, অন্য স্বল্প-সঞ্চয়

এবার আমরা আমাদের সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে ডিপোজিট রাখতে শুরু করলাম। নিজেরাই সঞ্চয় করা শুরু করে ফান্ড তৈরি করেছি। সেই টাকা খাটিয়ে কম্পিউটার ব্যবসাটাকে বাড়িয়েছি। কম্পিউটার এডুকেশনে কম্পিউটারের সংখ্যা বাড়িয়েছি, যাতে স্টুডেন্ট পিছু একটা করে কম্পিউটার দিতে পারি। এইবার লোকে বলেছে, তোমরা এই ক-টা লোকের মধ্যে টাকা নিচ্ছ, আমাদের সঞ্চয় করার সুযোগ দেবে না কেন? এইভাবে সদস্য সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজকে তা সাত হাজারের ওপরে চলে গেছে।

সঞ্চয়কারী ১ টাকা করে দৈনিক জমা রাখলে ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ টাকার ওপর ৯.০২% সুদের হিসেবে পাবে ৩৮০ টাকা, ১০ টাকা করে জমা রাখলে ৩৮৮০ টাকা। তার বাড়িতে প্রত্যেকদিন একজন কর্মী সাইকেলে করে গিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। প্রথমে আমাদের ছিল ৯.০২%, যখন তথাকথিত চিট ফান্ডের রমরমা শুরু হল, আমাদের ১% বাড়াতে হল। যে কর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ নিয়ে আসে, তাকে আমরা বলি সঞ্চয়-সাথি। তাকে দিতে হয় ৩%। আমাদের কালেকশন কম, তাই আমাদের গড় অফিস-সংক্রান্ত খরচ বেশি। বিল্ডিং ভাড়া, ইলেকট্রিসিটি, অফিস-স্টাফদের বেতন সব নিয়ে ৫%। ১৬-১৮% আমাদের মোট খরচ। এই খরচ করেও আমরা মানুষকে রিটার্ন দিতে পারছি, কিন্তু ব্যবসা যখন খারাপ থাকে, তখন দম বেড়িয়ে যায়। আমরা কাউকে ঘুষ দিই না। রাজনৈতিক চাঁদা মানে পঞ্চাশ টাকা, যেই আসুক।

২০০৮ সালে আমাদের রানিং ডিপোজিটর ৩০০০ ছিল। ২০০৯ সালে ৪০০০ হয়ে গিয়েছিল। দেড় বছর আগে আমাদের ডিপোজিটরের সংখ্যা কমে হয়েছে ছশো। এটা এমনি এমনি হয়নি। আমাদের ২২ জন এজেন্টকে আমরা তাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তারা আমাদের সাতগাছিয়া বাজারের মধ্যে ১৫টা বিভিন্ন কোম্পানির অফিস নিজেদের উদ্যোগে খুলিয়েছে। আমাদের কাছে আয় ওদের ৫-৭ হাজার টাকা আর ওইসব কোম্পানিতে আয় করতে পারবে ৩৩-৩৫ হাজার টাকা। আপনি একজন সদস্য, আপনাকে ওরা বোঝাচ্ছে, বসুন্ধরা কী দিচ্ছে? ৯.০২%। আমরা দেব ২৫%, ৩০%। তুমি চলো, তোমার টাকার রিস্ক আমার। ডিপোজিটরের সংখ্যা মারাত্মক কমে যাওয়া হয়েছে ওই প্রলোভনের ফলে। আমরা তাদের ধরে রাখতে পারিনি। একমাত্র যে মানুষগুলো আশির দশকে ছ্যাঁক খেয়েছে, ঘরপোড়া গরু, তারা বেশি ইন্টারেস্টের লোভে যায়নি।

সাতগাছিয়া বাজারকে কেন্দ্র করে ৪-৫ কিমির মধ্যে আমাদের ডিপোজিটর রয়েছে। ৩৬৫ দিনই যাতে সঞ্চয়-সাথি তার কাছে সাইকেলে পৌঁছাতে পারে। এটা সম্ভব না হলে আমরা দরখাস্তটা মঞ্জুর করি না। বর্তমানে আমরা দিন প্রতি কালেকশন পাই ১৩,৫০০ টাকা। প্রতিদিন ১০০ টাকা জমা দেওয়ার লোক ৩০-৪০ জন আছে। এর থেকে বেশি জমা পড়ে না। ১-২-৫-১০ টাকার কালেকশনই বেশি। আমাদের ডিপোজিটরদের ছ-মাস পর ৭৫-৯০% লোনের ব্যবস্থা আছে। সুদের হার মাসিক ১টাকা ১০ পয়সা। বছরের মাঝখানে টাকা ফেরত দেওয়া হয় না।

আমরা কম্পিউটারের কোনো স্টক রাখি না। একটা শো-রুম সাজাতে যে ক-টা মেশিন লাগে, সে ক-টা সাজানো আছে। সেটা বেরিয়ে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় অর্ডার হবে। পরদিনই ট্রান্সপোর্টে মাল নামিয়ে দেবে আমার কাছে। আমাকে অর্ডার দিলেই আমি মাল তুলব। বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, এই তিন জেলায় বেশিরভাগ পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও অফিস, স্বাস্থ্য দপ্তরে যত কম্পিউটার সাপ্লাই এবং সার্ভিস আমরা করি। এগুলো টেন্ডার দিয়ে পেতে হয়। সব ক্ষেত্রে পাইও না। সব জায়গায় নিয়ম মেনে টেন্ডার হয় না। আমাদের চেষ্টা থাকে, কম প্রফিট করে আমরা টেন্ডারটাকে ধরব। টোটালের ওপর সেলটা বেশি হলে পুষিয়ে যায়। সার্ভিসটাও আমরা ভালোভাবে করি। এই কাজে আমাদের স্টুডেন্টদের আমরা ৪০০০ টাকা মাইনে দিয়ে পেয়ে যাই। একটা ছেলে সারা দিনে ১৫০-২০০ কিমি মোটরসাইকেলে রান করে। পিছনে বাঁধা থাকে ডাই করা কম্পিউটার, সরঞ্জাম ইত্যাদির বোঝা। ঘুষ দিই না বলে, আমাদের চেক ইচ্ছাকৃত আটকে রাখা হয়েছে।

'পাঁচ বছর আগে শুরু করেন দৈনিক দু-টাকা দিয়ে'

আজ সোমবার কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে বাংলার মুখ পত্রিকার আড্ডার বিষয় ছিল চিট ফান্ড। উপস্থিত ছিলেন পরব, জনপথ, মন্থন, একক মাত্রা পত্রিকার বন্ধুরাও। আলোচনা উপস্থাপন করেন অনিন্দ্য ভট্টাচার্য। পরে অনেকেই তাতে অংশ নেন। তবে মেমারির সাতগাছিয়া বাজারের 'বসুন্ধরা পরিবার' থেকে আসা যুবক সুব্রত পোদ্দারের অভিজ্ঞতার আলোচনা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। কেন চিট ফান্ডে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা নিজেদের তাগিদে জড়িয়ে থাকে, তার একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেন এই আড্ডায়। সেখানেই তিনি শোনালেন রেণু বাগ-এর কথা। •

৪৫-৫০ বছর বয়সের রেণু বাগ। ভোরবেলা মাছের বাজারে গিয়ে প্রথম রেণুদিকে দেখেছি। ছ-সাত বছর আগের কথা। রেণুদি যখন মাছ ধরতে যাচ্ছেন, তখন বড়ো বড়ো মাছের আড়তদারেরা তাঁকে খিস্তি দিয়ে মাছ ধরতে বাধা দিচ্ছে। ভোর চারটে কি সাড়ে চারটে তখন। 'আগে সাড়ে তিন হাজার দিয়ে যা, তারপর মাছ তুলবি'। সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার ছিল রেণুদির। সমস্ত খিস্তি উপেক্ষা করে তিনি বেহায়ার মতো ওদের কাছ থেকে আরও পাঁচ কেজি মাছ ভিক্ষা চেয়ে নিলেন। বললেন, 'আজকেরটা আজকেই মিটিয়ে দেব'।

২০০৭ সালে যখন আমরা আমাদের সংস্থা বাইরের লোকের ডিপোজিটের জন্য খুলে দিলাম, রেণুদি পাসবই করালেন। তখন ওঁর দু-টাকার পাসবই ছিল। দৈনিক ২ টাকা তাঁর জমা। পরের বছর রেণুদি পাঁচটাকার পাসবই করেছেন। তারপর নানান কাজে আর লক্ষ করিনি। দু-তিন মাস আগে একদিন দেখি রেণুদি নিচের ঘরে চেয়ারে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রেণুদি ভালো আছো?'

— হ্যাঁ। এই তো একটা ম্যাচুয়িরিটি নিতে এসেছি।

— এই সাত হাজার কত টাকার।

— বলো কী! সাত হাজার!

— নতুন বই হয়েছে?

— হ্যাঁ, কুড়ি টাকার একটা বই করে দিয়েছি।

— দিদি, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে? সব সময় তো তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। এখনও কি ভোরবেলা খিস্তি খেতে হয়?

রেণুদি লজ্জায় পড়ে হাসতে লাগলেন।

— না-না। সেসব দু-তিন বছর আগেই মিটিয়ে দিয়েছি। আজ আমি এক টাকাও ধার করি না। যা মাছ কিনি নগদে।

'আমরা বেকার ... ডাকাতি আমরা করবই'

রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ১২ মে •

পয়লা বৈশাখেই গৃহপ্রবেশ হবে। হাতে টাকা নেই তাই তোমাদের খাওয়াতে পারব না। শুধু একটু নিয়মরক্ষার পুজো করেই ঘরে ঢুকে যাব। দেখা হলেই শঙ্খজিৎদা বলত আমাদের। ঘর বলতে আট লাখ টাকার হাউস বিল্ডিং লোন নিয়ে দু-কাটা জমির ওপর দুটো রুম আর গ্রিল ছাড়া জানালা। শক্তপোক্ত লক ছাড়া, ডাসা ছাড়া শুধু ছিটকানি দেওয়া দরজা। প্লাস্টার হয়নি ঠিকমতো। রঙ, রানিং ওয়াটার, ইলাস্টিক ওয়ারিং এসব টাকার অভাবে করা যায়নি। ডাকাতির ভয় কল্পনাতেও আসেনি শঙ্খজিৎ-এর। ডাকাতরা নাকি হোম-ওয়ার্ক করেই ডাকাতি করে। কোথায় ডাকাতি করলে মালকড়ি ভালো পাওয়া যাবে, সেটা নিশ্চিত না হয়ে পণ্ডশ্রম করতে ডাকাত আসবে না। বন্যাকে বারবার বুঝিয়েছে শঙ্খজিৎ। কোচবিহার বাবুরহাট, রাজেন চৌপথি সব জায়গায় রাত পাহারা আছে। রাজেন চৌপথি থেকে প্রদীপ আর্টের দক্ষিণ গলি ধরে ৫০০ মিটার গেলেই শঙ্খজিৎ-বন্যাদের নতুন বাড়ি আর পনেরো বছর ভাড়া বাড়িতে কাটিয়ে আসা পুরোনো সংসার। চারদিকে অনেক দূর অবধি ফাঁকা, বাড়িঘর নেই। তবুও ডাকাতের ভয় কখনো হয়নি। আর কী আছে যে নেবে?

কখন যে বন্যা-শঙ্খজিৎ আর তাদের দু-বছরের মেয়ে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে বসেছে বিছানায় — মনে করতে পারছে না। অন্ধকার ঘরে কিছু ভোজালি আর টর্চের আলো মশারির ওপর ঘুরছে। দেওয়াল ঘড়িতে রাত দেড়টা। এখান থেকে স্মৃতি শুরু। দু-জন জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করছে, কিছুই মিলছে না। লকার ভাঙছে। সেখানেও কিছু পাচ্ছে না। এভাবে প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে পুরো ঘর ওলট পালট। একবার বন্যার মেয়ে একটু কেঁদে উঠল। বন্যাও ভয়ে গুটিশুটি। ডাকাতরা ধমকে মেয়েকে চুপ করাতে বলে। সাথে বন্যাকে বলে, তুমি নিশ্চিত থাকো তোমার কিছু করব না। আমাদেরও বোন আছে। কিন্তু কী করব? আমরা বেকার, চাকরি বাকরি নাই। ডাকাতি আমরা করবই।

শঙ্খজিৎ আর স্নায়ুর জোর ধরে রাখতে পারল না। যদি কিছু না পেয়ে ছোটো সন্তানের গায়ে ভোজালি চালিয়ে দেয়? এসব ভাবতেই মনে হল, বলে দেওয়াই ভালো। ফ্রিজের ভেতরে লোন-এর একটা ইনস্টলমেন্ট-এর বারো হাজার টাকা আছে। শঙ্খজিৎ জানত না, ওদের সামান্য সোনার গয়নাও ওখানেই রেখেছে বন্যা। টাকা গয়না নিয়ে ওদের ডাকাতরা থ্যাঙ্ক ইউ বলে।

পরদিন ৮ মে সকালে বাড়ির সামনে গেলে একটা জটলা দেখতে পেলাম। এএসপি এসেছে ইনকোয়ারিতে। জটলায় সবাই বলছে, চারদিকে ঘনঘন ছোটোখাটো ডাকাতি ঘটে চলেছে। কেউ বলছে, এটা শুরু বলা যায়। এখন ডাকাতি ছিনতাই বাইক চুরি এসব চলতেই থাকবে। সারদা কাণ্ড সহ অন্য সব চিট ফাণ্ড সংস্থা উঠে যাওয়ায় যে বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক নেতিবাচক শূন্যতা তৈরি হয়েছে সেটা এভাবেই সমাজ জুড়ে ফুটে বেরোবে।

প্রতিষ্ঠিত হল 'দক্ষিণবঙ্গ সংগ্রহশালা'

অমৃতলাল পাড়ুই, ২ মে •

পরম নির্ভরতায় গভীর বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্যানভাস, স্বপ্নের রঙ আর ইচ্ছা-তুলির টান সম্বলিত সৃষ্টিকর্মের উপাদান সংগ্রহ করে জনসমক্ষে প্রতিবিম্বিত করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ডায়মন্ডহারবার শহরে 'দক্ষিণবঙ্গ সংগ্রহশালা'র দ্বারোদ্ঘাটন করা হল। চারটি বড়ো কামরায় ও লম্বা বারান্দায় প্রাথমিকভাবে সংগৃহিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্র, পট, পুঁথি, দারুশিল্প, প্রত্নমূর্তি, ও সংস্কৃতি আলোচিত পুস্তক।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশদ্বার উন্মোচন করেন গুরুসদয় সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধায়ক ড. বিজন কুমার মণ্ডল। প্রধান অতিথি ছিলেন কালিদাস দত্ত সংগ্রহশালায়ার তত্ত্বাবধায়ক প্রতীপ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিত্রশিল্পী ও প্রাবন্ধিক অমরেশ মুখোপাধ্যায়। ডায়মন্ডহারবারের বাসিন্দা সদ্যপ্রয়াত দিলীপ চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর পিতার স্মৃতিতে রাখা 'রামপ্রসাদ চক্রবর্তী স্মৃতিভবন' এই সংগ্রহশালার জন্য দান করে গেছেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিল্পী সাহিত্যিক সংগ্রাহক সংগঠক বহু গুণী মানুষ উদ্যোক্তাদের পাশে থেকে ভবিষ্যৎ প্রাসঙ্গিকতার উদ্যোগ গড়ে তোলার প্রেরণা দিয়েছেন। উদ্যোগ নিয়েছেন 'শিল্পী সমাজ'-এর পক্ষ থেকে গোপাল মিদ্যা, বিধান দেব, শঙ্কর সরকার, ইন্দ্রজিৎ কাঞ্জি, তারকনাথ হালদার প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীগণ। প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকেল ৩টে থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য এই সংগ্রহশালা উন্মুক্ত থাকবে। মাঝে মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি তথা আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ে আলোচনাসভার ব্যবস্থা করা হবে।

গরম ও হাওয়া

তমাল ভৌমিক, ভবানীপুর, ৮ মে •

নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের ট্রেন ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেন ঢোকার মুখে একটা মেয়ে দু-হাত তুলে লাফাতে আরম্ভ করল, 'এয়ার কন্ডিশনড এয়ার কন্ডিশনড'। তার সঙ্গী ছেলেটো হাসছে। এসি ট্রেন আসছে। এদেরকে দেখে মনে হয় মণিপুরি। না হলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো রাজ্যের তো বটেই। ফরসা মুখ আর ল্যাপপোঁছা নাক-চোখ দেখে যাদেরকে আমরা সাধারণত 'নেপালি' বলে থাকি সেরকম দুজন।

এসির কুফল

- *কিছু কিছু জীবানুর বাড়বৃদ্ধি ঘটে এসি-তে।*
- *জলের অভাব, চামড়ার ক্ষতি।*
- *মুক্ত অক্সিজেনের অভাবে শরীরে রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতার হানি*
- *মুক্ত অক্সিজেনের অভাবে ব্লাড প্রেশার ও হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি*
- *সেরোটোনিন বা 'সুখ হরমোন'-এর ক্ষরণ কমে যাওয়া*
- *এসি বাষ্পায়নের মাধ্যমে ঘর ঠান্ডা করে, ফলে নাক মুখ শুকিয়ে যায়*
- *এসির রেফ্রিজারেন্টগুলি বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরের ক্ষতি করে*

এরা না হয় পাহাড়ি এলাকার মানুষ – সমতলের বৈশাখী রোদের প্রখর তাপে নাজেহাল। কিন্তু এখানকার মানুষরাও তো দেখছি পটাপট এসি বা এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন লাগিয়ে ফেলছে। শ্যামবাজারে আমাদের ছাত্রীরা থাকে ভাড়া বাড়িতে। জ্যাঠা-ঠাকুমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে তাদের সাকুল্যে একখানাই ঘর। ওই ঘরেই তিনজনের খাওয়া শোয়া পড়াশুনা টিভি দেখা – সব। সেই ঘরে একটা এসি লাগিয়ে ফেলেছে। গড়িয়াতে আমার এক বন্ধু একখানা আর এক আত্মীয় দু ঘরে দুখানা এসি লাগিয়েছে। এরা সকলেই কিন্তু মধ্যবিত্ত — স্কুল কলেজ অফিসে চাকরি করে। আগেকার মধ্যবিত্তদের ফ্যানের জায়গা নিয়ে ফেলছে আজকের এসি। জায়গা নিয়ে ফেলছে ঘরের মধ্যে যত না, মনের মধ্যে আরও বেশি। আমার এক ছাত্রীর কাছে একটা ঘটনা শুনে সেরকমই মনে হল।

ছাত্রী পড়ে দক্ষিণের এক ঐতিহ্যবাহী মিশনারি স্কুলে। সেখানে সব ক্লাসরুমে এসি লাগানো আছে। ছাত্রীর ক্লাসে একজন টিচার এক 'দুষ্টু-ছাত্রী'কে পিছনের বেঞ্চ থেকে সামনে আসতে বলায় সে জানায় যে তার জ্বর হয়েছে, সামনের দিকে এসি লাগানো আছে বলে সেদিকে বেশি ঠান্ডা, তাই সে সামনে বসতে চায় না। টিচার তাকে সামনের বেঞ্চে জোর করে বসালে ছাত্রীটি এসি বন্ধ করে দেওয়ার অনুরোধ করে। তাতে শিক্ষিকা জানান যে তাঁর খুব গরম লাগছে এবং ওই একটি ছাত্রীর জন্য তিনি এসি বন্ধ করতে পারবেন না। ফলত, এসি চালু থাকে এবং এর ফলে ওই ছাত্রীটির কিছু না হলেও আমার ছাত্রীটির ঠান্ডা লেগে গেছে।

এই গরমে এসির ঠান্ডা কেন ফ্যানের হাওয়া লাগারও যার চান্স নেই তেমন একজনের কথা শুনলাম আমার এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে। মাস্টারমশাই রিক্সায় চেপেছিলেন দুপুরবেলায় আর প্রচণ্ড রোদ্দুর দেখে সাইকেলরিকশা চালককে বলেছিলেন, 'আমার ছাতাটা একটু মাথায় দেবেন নাকি?' সেখানও থেকে কাহিনীর শুরু। রিকশাওয়ালা বলেন যে তিনি ছাতা বা টুপি মাথায় দিয়ে রিক্সা চালান না, অভ্যেস খারাপ হওয়ার ভয়ে। শুধু প্রতি খেপ রিক্সা টানার পরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটু ঘাম শুকিয়ে নেন এবং তাতেই বেশ থাকেন। তিনি আরও বলেন যে জয়নগরের থেকে শহরতলিতে এসে যেখানে তাঁর ডেরা সেখানে ইলেকট্রিক ফ্যানও তাঁর নেই। প্রথম রাতে গরমে ঘুমের একটু কষ্ট হয়, কিছুটা হাতপাখা নেড়ে সময় কাটানোর পরে বাইরে থেকে একটা হাওয়া আসে, তাতেই ঘামে ভেজা গা তাঁদের শীতল হয়, তখন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েন।

শুনে আমি মাস্টারমশাইকে বললাম, প্রায় একই রকমের বর্ণনা আমাদের কাজের মেয়ের থেকে শুনেছি। ওরা থাকে আরও দক্ষিণে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, মানে এসইবি-র এলাকায়। সেখানে ইলেকট্রিক থেকেও থাকে না। ফলে তার ঘরে ভাড়া করা ফ্যান প্রায় প্রতিরাতে অনেকক্ষণ বন্ধ থাকে। ঘরে হাওয়া ঢোকে না, গুমোট। তখন বাইরে বারান্দায় গিয়ে শুয়ে হাওয়া পেতে হয়। পেতে হয় মানে পেতেই হয়। না হলে ভোররাতে উঠে আবার কাজেও করতে ছুটবে কী করে?

খবর দিন খবর নিন

কেলেঙ্কারির চিট ফান্ডের সঙ্গে ভুয়ো শিল্পায়ন আর পণ্যের ফাটকা বাজারের সরাসরি সম্পর্ক

আকাশ মজুমদার, জলপাইগুড়ি, ১৫ মে

আমরা ছোটোবেলা থেকে পরিচিত লোকজনকে টাকা রাখতে দেখেছি পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, ইনসুরেন্সে। তার বাইরে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের কথা শুনতাম — পিয়ারলেস, সাহারা। কেউ কেউ শেয়ারে টাকা রাখত। মিউচুয়াল ফান্ডেও টাকা রাখত। কিন্তু সেগুলো কম। আমিও ছোটোবেলায় মাসি কাকুদের দেওয়া উপহারের টাকা রেখেছি পোস্ট অফিসে। হয়তো হাজার টাকার কিষান বিকাশ পত্র কেনা হয়েছে, সেটা হয়তো ৬–৭ বছর পরে ২০০০ টাকা হয়েছে। ক্লাস সেভেন এইটে মা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পোস্ট অফিসে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল।

২০০০ সালের পর থেকে আস্তে আস্তে দেখতে পেলাম, বিভিন্ন নামে কিছু কিছু সংস্থা উঠে আসছে। প্রথমদিকে বিভিন্ন চ্যানেলে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। আস্তে আস্তে দেখি আমাদের শহরে একটা একটা করে ব্রাঞ্চ অফিস খুলছে। যেমন রোজভ্যালি, প্রয়াগ, আইকোর, অ্যালকেমিস্ট। একটা কৌতূহল ছিল। এরা কারা? তবে প্রত্যেকেই এলআইসি–র একটা লোগো ব্যবহার করত। অর্থাৎ এলআইসির সঙ্গে এদের একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে বুঝিয়ে তারা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করত। ওদের সিস্টেমটা যেহেতু নেটওয়ার্কিং সিস্টেম, এক থেকে পনেরো অবধি ব্যাঙ্ক থাকে এজেন্টদের, কে কার নিচে কত লোক জোগাড় করতে পারে, তাই পরিচিত ধরেই আমানত তোলা হত। প্রত্যেকেই কাছের লোককে অ্যাপ্রোচ করত। আমিও করেছি কিছু রেকারিং বা ওই ধরনের আমানত। ছোটো ছোটো। পরিচিতরা আসত এজেন্ট হিসেবে। ফলে অস্বীকার করা কঠিন হয়ে যেত। ধীরে ধীরে ওরা সমাজের খুব ভেতরে ঢুকে গেল, যা ব্যাঙ্ক-পোস্ট অফিস–ইনসুরেন্স পারেনি। এজেন্টদের জাল থেকে ওপরের দিকের লিডাররা বুঝে যেত, কার কাছে টাকা আছে। যেহেতু সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর দাঁড়িয়ে, তাই কোম্পানির বদলে ব্যক্তিকে ভরসা করার ব্যাপার ছিল। কোম্পানির কাগজপত্র নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

একটা কৌতূহল তবু থেকে যায়। তাই আমি কাগজপত্র দেখতে চাইলাম। দেখলাম, কিছু ভারত সরকারের সিল দেওয়া কাগজের জেরক্স। প্রত্যেকেই জেরক্স ব্যবহার করে। সবার মোটামুটি একই ধরনের কাগজপত্র। প্রত্যেক কোম্পানিই বলত, আমার কোম্পানির কাগজপত্র ঠিক। বাকিদের কাগজ ভুলভাল। ওগুলোতে টাকা রাখা ঝুঁকি। মূলত তিন ধরনের আমানত স্কিম — রেকারিং ডিপোজিট, এক বা দুই বা তিন বছরের; ফিক্সড ডিপোজিট, তিন পাঁচ সাত বছরের। আরেকটা স্কিম ছিল এদের, এমআইএস বা মাসিক সুদের স্কিম। এমআইএস-এ যে কেউ তিরিশ হাজার টাকা তিন বা পাঁচ বছরের জন্য জমা রাখলে প্রতি মাসে যে সুদ পাওয়া যায় তা পোস্ট অফিস বা ব্যাঙ্কের থেকে অনেক বেশি। সেই জন্য লোকে এতে টাকা রাখত।

ক্রমশ পরের দিকে দেখা গেল, এরকম ভুরি ভুরি কোম্পানি বেরোচ্ছে। সবাই বলত, তাদের বিভিন্ন প্রকল্প আছে — রিয়েল এস্টেট, কোল্ড ড্রিংক্স, মিনারেল ওয়াটার, ফুড, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি — এরা সেখান থেকেই রিটার্ন দেয়। এবং এদের যা লাভ সেইসব প্রকল্পে, তা আমানতকারীদের প্রদেয় সুদের থেকে অনেক বেশি। তাই কোনো সমস্যা নেই। ফলে জমা রাখা টাকা মার যাওয়ার ভয় নেই। প্রত্যেকেই বলত, তারা অ্যাসেট ভিত্তিক কোম্পানি। আর বাকিরা অ্যাসেট ভিত্তিক কোম্পানি নয়। এদের ছাপানো ব্রোশিওরে এবং ওয়েবসাইটে এদের বিভিন্ন প্রজেক্ট সম্পর্কে ফলাও করে লেখা থাকত। কিন্তু তার বাস্তব ঠিক ভুল বিচার করা স্থানীয় আমানতকারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে শুনেছি, এদের এক দু-টো প্রকল্প চলে, বাকিগুলো ভাঁওতা।

এসব বামফ্রন্টের আমল থেকেই চালু হয়েছে, মোটামুটি ২০০০ সাল থেকে। যত দিন গেছে, এরা বুক ফুলিয়ে কাজ করতে লেগেছে।

এর পরে দেখলাম, আরেক ধরনের কোম্পানি বাজারে এল — আমার ভাষায়, হাই রিস্ক চিট ফান্ড। এদের আইডিয়াটা রোজ ভ্যালি বা আইকোর থেকে একদম আলাদা। প্রথম এই ধরনের কোম্পানি যার নাম শুনলাম, রয়াল। এদের হেড অফিস কোচবিহারে। পরে এরা মোটামুটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অফিস তৈরি করে। এদের মূলত একটাই স্কিম ছিল, এমআইএস। কারো কারো ফিক্সড প্ল্যান ছিল। এমআইএস প্ল্যানটা এরকম — কেউ যদি আঠারো মাসের জন্য এক লাখ টাকা রাখে, সে তাহলে মাসে আট হাজার টাকা করে রিটার্ন পাবে আঠারো মাস ধরে। এবং আঠারো মাস পরে মূল টাকাটা ফেরত পাবে। যে এজেন্টের মাধ্যমে এই টাকাটা উঠবে, সে পাঁচ পার্সেন্ট করে প্রত্যেক মাসে পাবে। অর্থাৎ কেউ যদি এজেন্ট হয়ে টাকা রাখে, তাহলে সে নিজেই ৮+৫ অর্থাৎ তেরো পার্সেন্ট করে পাবে প্রতি মাসে। আবার আঠারো মাস পরে সে মূলটা ফেরত পাবে। তেরো পারসেন্ট করে পেলে সাত মাসের মধ্যে মূল টাকাটা উঠে আসছে। অর্থাৎ সাত মাসের ঝুঁকি। বাকি যা পাবে তা উপরি। আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এটা শিগগিরি বন্ধ হবে। কী করে এটা সম্ভব? কিন্তু কোথায় কী, দেখলাম মানুষ দিব্বি আমানত রেখে সুদ পাচ্ছে। এবং যারা তা পাচ্ছে, তাদের মাধ্যমে এটা ছড়াচ্ছে বিভিন্ন লোকের মধ্যে। প্রথমে এদের কোনো বিজ্ঞাপন থাকত না। পরে উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপন দেখলাম। এরা বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলে ফেলল।

এরপর এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও কোম্পানি এল, যেমন ইউনিক স্টার, শিবশংকর, অ্যাক্সিস রিটেল ইন্ডিয়া প্রভৃতি। এদের মধ্যে রয়াল আর ইউনিক স্টার অনেক বড়ো পরিমাণে কাজ করেছে। এদের অফিসে আমি নিজে গেছি, কথা বলেছি। এদের বক্তব্য, এদের কোনো প্রকল্প নেই। এরা পুরো টাকাটাই শেয়ারে খাটায়। মোট তেরো পার্সেন্ট সুদ দেয় মাসে। কিন্তু এরা এর থেকে অনেক বেশি টাকা শেয়ারে খাটিয়ে লাভ করে। এরা খাটায় কমোডিটি ট্রেডিং বা পণ্যের শেয়ার বাজারে। সোনা, প্ল্যাটিনাম, ক্রুড অয়েল প্রভৃতি মার্কেটে। ওরা বলেছিল, ওই মার্কেটটা অন্য যে মূল শেয়ার বাজার, তার থেকে অনেক বেশি সময় ধরে চলে। সকাল ন-টা থেকে রাত ন-টা। ফলে সারাদিনে অনেকটা সময় থাকে, সারাদিনে বারবার টাকাটা খাটানো সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত, সাধারণ শেয়ার বাজার চলে সকাল ন-টা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত। যাই হোক, ওদের দাবি ছিল, কমোডিটি ট্রেডিং–এর ফলে ওদের প্রতিদিন ৮–১০ শতাংশ লাভ থাকে আসলের ওপর। সারা মাসে ওরা অনেকটা লাভ পায়। তার খুব অল্প অংশই তারা আমানতকারী বা এজেন্টদের দেয়। ওরা ডাইরেক্ট ব্রোকিং হাউস বা শেয়ারবাজারের সরাসরি দালাল। সেই লাইসেন্স ওদের আছে। ফলে ওদের পক্ষে এতটা সুদ দেওয়া কোনো সমস্যা নয়।

কিন্তু আমি দেখেছি, এদেরও নথিপত্র শক্তিশালী নয়। এরা কেবল একটা ছাপানো সার্টিফিকেট এবং একটা টাকার রসিদ দেয়। পরে আমি রয়াল-কে দেখেছি, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের একটা জিরো ব্যালেন্সের অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছে আমানতকারীদের। এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ড-ও দিয়ে দিচ্ছে। ফলে আমানতকারী মাসিক সুদ ওই এটিএম দিয়ে সরাসরি তুলে নিতে পারছে।

পরের দিকে স্কিমগুলো বদলাতে থাকে, বা আরও আগ্রাসী হতে থাকে। একটা কোম্পানি অ্যাক্সিস রিটেল ইন্ডিয়া, এদের প্ল্যান ছিল, দশ মাসে পুরো টাকাটা ফিরিয়ে দিত, অর্থাৎ মাসিক হিসেবে ধরলে দশ শতাংশ, এর সাথে আট শতাংশ করে মাসিক সুদ। তার সঙ্গে এজেন্ট–এর কমিশন পাঁচ শতাংশ। অর্থাৎ মোট ২৩–২৪ শতাংশ করে মাসে দিত। অর্থাৎ চার-পাঁচ মাসেই মূল টাকাটা উঠে আসে।

কয়েক মাস আগে এদের যখন রমরমা ব্যবসা, উত্তরবঙ্গে এরা বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ফান্ডিং করা শুরু করে। জলপাইগুড়ি ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল স্পনসর করে ইউনিক স্টার। বাইরে থেকে আর্টিস্ট এনে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামটাতে ইউনিক স্টার নাকি তিরিশ লাখ টাকা দিয়েছিল। একাধিক ব্যানার, বিশাল বিশাল গেট ... কোচবিহারের এবারের রাসমেলা এই ধরনের কোম্পানির বড়ো বড়ো গেটে ভর্তি হয়ে গেছিল।

সারদা কাণ্ডের পরে, হঠাৎ করে এদের প্রত্যেকের অফিস কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়। এদের বক্তব্য, সারদা কাণ্ডের ফলে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা কেটে গেলেই আবার এরা কাজ শুরু করবে। এদের কিছু উঁচুতলার এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এবারে তারা পুরোনো সব স্কিমগুলো বন্ধ করে দেবে, কারণ সেগুলো অবৈধ ছিল, বদলে শুরু করবে কম সুদের কিছু প্ল্যান, যেগুলো নাকি বৈধ।

এই ধরনের কোম্পানিগুলি আসার আগে আরেক ধরনের কোম্পানি এসেছিল। কয়েক মাসের জন্য কিছু অনলাইন কোম্পানি তৈরি হয়েছিল। যেমন — ই–গ্লোবাল, ওয়ে টু লাইফ, আর্য গ্রুপ প্রভৃতি। এদের প্রত্যেকের এক একটা সুন্দর ওয়েবসাইট থাকত। হঠাৎ করেই এদের অনলাইন কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায় এবং আর এদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরা প্রতিদিন ১–২ শতাংশ করে সুদ দিত। এদের নিয়ম ছিল : একটা আইসিআইসিআই, বা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক বা এসবিআই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট করতে হত আমানতকারীদের। সেখানে টাকা ডিপোজিট করতে হত। তারপর ওরা অনলাইনে একটা আইডি জেনারেট করত। সেই মতো অ্যাকাউন্টে সুদ চলে আসত প্রতিদিন। দিনে এক শতাংশ হলে মাসে তিরিশ শতাংশ!

সে সময় দেখা যেত, কোনো কোনোদিন ব্যাঙ্কে এত টাকা জমা পড়ছে যে, ব্যাঙ্কগুলি মাঝে মাঝে টাকা জমা নিতে অস্বীকার করতে বাধ্য হত। তবে এত টাকা জমা পড়া সত্ত্বেও সরকার বা প্রশাসন স্তরে কোনো তদন্ত হয়েছে বলে শুনিনি। আমার পরিচিত একজনই সাত লাখ টাকা ডিপোজিট করেছিল। তার তিনদিনের মধ্যে ওই কোম্পানির ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়। ওই সাত লাখ টাকা পুরো হাওয়া হয়ে যায়। কারণ দাবি করার কোনো জায়গা ছিল না। শুধু অনলাইন। কোনো কাগজপত্র ছিল না, কোনো প্রমাণ ছিল না। আজ সারদা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তখন এই নিয়ে প্রশাসন, সরকার, মিডিয়া কেউ কিছু বলেনি। আমি শুনেছি, এটা হয়েছে সারা ভারত জুড়ে। কোটি কোটি টাকা মার গেছে। এজেন্টরা বহুদিন এলাকা ছাড়া ছিল।

কয়েক মাস আগে শোনা গেল, এই ধরনের কোম্পানিগুলি প্রত্যন্ত গ্রামে হানা দিয়েছে। তারা সাত দিনে ডবল বা পনেরো দিনে ডবল দিচ্ছে। দিনহাটা বা আলিপুরদুয়ার — এইসব দিকে এগুলো দেখা গেছিল। সেই কোম্পানিগুলোকে পুলিশ যখন বন্ধ করতে যায়, তখন স্থানীয় আমানতকারীরাই পুলিশকে আক্রমণ করে, পুলিশের জিপ পুড়িয়ে দেয়। তবে তাদের এখন কী অবস্থা, তা জানি না।

সাপে কাটা রুগি ফেরালো চার হাসপাতাল, মৃত্যু

শমীক সরকার, কলকাতা, ১২ মে

গত বুধবার নদিয়া জেলার মদনপুর-এর শান্তিনগরের সবিতা নাগ (৫০) নামে এক মহিলাকে তাঁর ঘরের বাইরে চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়ায়। সময় রাত সাড়ে দশটা। মহিলা স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তাঁর স্বামীর স্টেশনের ওপর চায়ের দোকান। দুই মেয়ে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। অন্য মেয়ে টিউশন করেন।

বাড়িতে দুটি বাঁধন দিয়ে সবিতার আত্মীয়রা তাঁকে নিয়ে প্রথমেই যায় কল্যানী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে। সেখানে ডাক্তার বলে বাঁধন খুলে দিতে। তারপর সবিতাকে একটা ইনজেকশন দিয়ে বলে, ক্রিটিক্যাল কেস, গান্ধীতে নিয়ে যান। গান্ধী হল কল্যানীর আরেকটি সরকারি হাসপাতাল। সেখান থেকে তাকে বলে কলকাতার পিজি হাসপাতাল নিয়ে যেতে। মাঝখানে কল্যানীর মেডিভিউ নার্সিং হোমে নিয়ে গেলে তারা বলে দেয়, সাপে কাটা রোগী তারা নেয় না।

পিজি হাসপাতালে তাকে বলে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যেতে। রাত একটার সময় নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি হন সবিতা। নীলরতন সরকার হাসপাতালে সবিতার চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসা শুরু হতে না হতেই সবিতা একা একাই শৌচাগারে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে পা এবং মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তাররা অনেক রকম ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করার চেষ্টা করলেও সে জ্ঞান আর ফেরে নি। শনিবার রাত ৯ টায় সবিতা মারা যান।

ঘটনাচক্রে সবিতা আমার মায়ের পরিচিত। তাই জানতে পারলাম।

আধুনিক জীবন নিয়ে আমরা অনেক কথা বলে থাকি। কিন্তু গ্রামের একজন সাধারণ ঘরের মহিলাকে যদি রাতে সাপে কামড়ায়, তাহলে তার চিকিৎসার এই হাল আমাদের উন্নয়নের বড়াইকে কি ব্যঙ্গ করে না?

পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনের ওপর চড়াও পুলিশ, অভয় সাহু ফের আটক

পিপিএসএস-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে, ১১ মে •

ওড়িশার জগৎসিংহপুর জেলার দখল দক্ষিণ কোরিয়ান কর্পোরেট পস্কোর হাতে চলে গেছে। জেলাশাসক এবং জেলার পুলিশ সুপার এমন ব্যবহার করছে, যেন তারা ওই কোম্পানি এবং তাদের কনট্রাক্টরদের প্রতি দায়বদ্ধ — এমনই ভাষায় অভিযোগ করেছে পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতি। তারা একটি আবেদনে জানিয়েছে, গত ৬ মে থেকে জগৎসিংহপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে শুরু করে প্রস্তাবিত পস্কো প্রকল্প পর্যন্ত একটি গহ্বর খোঁড়া শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন এবং সেটাও করা হচ্ছে লুকিয়ে চুরিয়ে। এই নিয়ে পস্কো প্রতিরোধের গ্রামগুলিতে নতুন করে হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

৯ মে প্রায় ৮০০ পুলিশের উপস্থিতিতে ঢাকঢোল পিটিয়েই পস্কো প্রকল্পের পাঁচিল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে গোবিন্দপুর গ্রামে। শয়ে শয়ে গাছ কাটা হয় এর জন্য। আজ ১১ মে সকালবেলা পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির নেতা অভয় সাহুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তত ৫০টি মামলা দিয়েছে প্রশাসন। তাঁকে জগৎসিংহপুরের কুজঙ্গ জেল-এ রাখা হয়েছে। এর আগে ২০০৮ সালেও অভয় সাহুকে জেলে পোরা হয়েছিল ১৪ মাসের জন্য। তারপর ২০১১ সালের শেষের দিকে ৪ মাসের জন্য ফের বন্দী করা হয় তাঁকে।

গত আট বছর ধরে চলা পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনের ওপর পুলিশি নির্যাতন, পস্কোর ভাড়াটে গুণ্ডাদের পীড়ন এবং বোমা মেরে আন্দোলনকারীদের মেরে ফেলা — সবই হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ মামলা রুজু করা হয়েছে প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের ওপর। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে অন্তত ১৫০০ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে, যাদের মধ্যে ৩৪০ জন মহিলা। গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে গ্রামবাসীরা গ্রামের বাইরে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পর্যন্ত যেতে পারে না।

গ্রামবাসীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধকে আমল না দিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনীর মদতে কর্পোরেট আগ্রাসন উৎসাহ পেয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে। ওড়িশার নিয়ামগিরিতে বক্সাইট মাইনিং হবে কি না, তা ঠিক করার জন্য গ্রামসভাকে দায়িত্ব দিলেও পার্শ্ববর্তী খান্দাধার পার্বত্য এলাকায় মাইনিং-এর অনুমতি পেয়েছে পস্কো। সুন্দরগড় জেলার এই পার্বত্য এলাকায় লোহা আকরিকের খননের ওপর ওড়িশা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। সেই স্থগিতাদেশ খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি লোধা-র বেঞ্চ ১০ মে একটি রায়ে জানিয়েছে, কেন্দ্র সমস্ত বিরোধিতা খতিয়ে দেখে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিক। পস্কো কোম্পানি এই অর্ডারকে স্বাগত জানিয়েছে। পস্কো ও পস্কোপন্থীদের পালে হাওয়া দিয়েছে এই রায় — এমনই মত পস্কো প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মীদের।

এত অমানবিকতার সঙ্গে যুঝেও বাঁচাতে পারিনি তাঁকে

৯ মে, কাজী ফয়জল নাসের, কানখুলি, মহেশতলা •

সোমবার ২৯ এপ্রিল কলকাতা শহরে সরকারি আইনকানুনের জালে অমানবিকতার এক অদ্ভুত রূপ দেখতে পেলাম। অফিস ফেরত মাঝেরহাট স্টেশনের প্লাটফর্মে এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধকে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমি ও আমার সহযাত্রী দুই বন্ধু, স্টেট ব্যাঙ্কের সোমনাথ পাল আর ব্যাঙ্ক অব বরোদার সায়ক নন্দী, স্রেফ মানবিকতার খাতিরে কলকাতা পুলিসের হেল্পলাইন ১০৭৩-এ ফোন করি। সেখান থেকে বলা হয় যেহেতু বিষয়টি রেলওয়ের এলাকাভুক্ত তাই স্টেশন মাস্টারের সাথে যোগাযোগ করে আরপিএফ-এর সাহায্য নিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। আমরা স্টেশন মাস্টারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি নির্বিকার চিত্তে বলে দিলেন যে তাঁদের কিছু করার নেই, অ্যাকসিডেন্ট হলে বা মারা গেলে তারা 'বডি' তুলতে পারেন, নচেৎ নয়।

এরপর শুরু আমাদের অবিরাম চেষ্টা মৃতপ্রায় লোকটার জন্যে কিছু করার। অথচ স্টেশন ভর্তি মানুষের কারো কোনো হেলদোল নেই। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করার পর নিউজ টাইম চ্যানেলের দু'জন সাংবাদিক ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের ক্যামেরার সামনে পড়ে অবশেষে স্টেশন মাস্টার বালিগঞ্জ জিআরপি-তে খবর দেন। আরপিএফ পৌঁছায় প্রায় আটটার সময়। তারপর আমরা তাঁকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সমস্ত সইসাবুদ মিটিয়ে ভর্তি করলাম রাত সাড়ে নটায়। ইতিমধ্যে ঘটনাচক্রে পেয়ে গেছি আমার ফেসবুক বন্ধু তথা রাইটার্সেই আমার সহকর্মী ইন্দ্রনীলকে। সেও আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। আর নিউজ টাইম-এর শৌভিক সরকার, শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত বিষয় তদারকি করে তবে বিদায় নেন। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তারবাবু যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন। কিন্তু কর্তব্যরত সিস্টার দু–জন এতই খারাপ ব্যবহার করেন আমাদের সাথে যে শেষ পর্যন্ত আমাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও অল্প তর্কাতর্কিও হয়।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর কাছে ওই ব্যক্তি কোনোরকমে জানান যে তাঁর নাম শৈলেন সরকার এবং বাড়ি বাঁকুড়ার রাঙামাটি অঞ্চলে। পরের দিন হাসপাতাল থেকে বেহালা থানায় খবর পাঠানো হয় এবং বেহালা থানা থেকে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক থানায় যোগাযোগ করে শৈলেনবাবুর বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়।

কিন্তু এতকিছুর পরেও আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করার পর ২ মে, বৃহস্পতিবার বিকেলে অবশেষে তিনি হার মানেন। শুক্রবার তাঁর বাড়ির লোকের হাতে শৈলেনবাবুর মরদেহ তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজে মানবিকতা আজ লুপ্তপ্রায় হতে চলেছে। তারই মাঝে আমাদের সাথে যারা যারা এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের সকলকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ধিক্কার জানাই মাঝেরহাট স্টেশনের স্টেশনমাস্টার, বিদ্যাসাগর হাসপাতালের নার্স সহ তাদেরকে, যাদের অসহযোগিতা আর দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতার জন্য সেই বৃদ্ধের চিকিৎসায় অন্তত দু–ঘন্টা দেরি হয়। আশা করব ভবিষ্যতে আর কোনো মানুষের যেন শৈলেনবাবুর মতো অসহায় অবস্থায় পড়তে না হয়। তাই আমাদের বোধহয় আরও একটু মানবিক হওয়ার জন্য শপথ গ্রহণের সময় হয়েছে।

প্রবীণদের চেষ্টায় বাঁচল ব্যাঙ্কপ্লটের ঝিল

শ্রীমান চক্রবর্তী, ব্যাঙ্ক প্লট, হালতু, ২ মে •

অবশেষে হালতু এলাকার ব্যাঙ্ক প্লট–সুইট ল্যান্ড–শহিদ নগর মধ্যবর্তী দীর্ঘদিনের অবহেলিত ঝিলটি স্থানীয় প্রবীণ নাগরিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রক্ষা পেল। জমি হাঙ্গর, প্রোমোটার, দালাল, রাজনৈতিক কিছু কুচক্রীদের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে, এলাকার মধ্যবয়স্ক ও প্রবীণ নাগরিকরা পুরসভাকে দিয়ে ঝিলটির সংস্কারের কাজ শুরু করাতে সক্ষম হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রবীনরা ধন্যবাদ জানিয়েছে অসরকারি সংস্থা 'নেচার মেট্স'–এর কর্মীদের, ৯২ নং ওয়ার্ডে ও ১০ নং বরোর ১০০ দিনের কর্মীদের, এম.এম.আই.সি. (পরিবেশ) সঞ্চিতা মণ্ডল, ৯২ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী মধুছন্দা দেব ও ১০ নং বরোর চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানানো হয়েছে বিক্রমগড় জলাশয় আন্দোলনের পুরোধা শ্রী দীপক ভট্টাচার্য মহাশয়কে, যিনি এখানকার আন্দোলনের সংগঠন 'জনস্বাস্থ্য, জলাশয় সংরক্ষণ – সংস্কার মঞ্চ'কে জলাশয় আন্দোলনের দিক নির্দেশ করেছেন।

মঞ্চের পক্ষ থেকে আবেদন রাখা হয়েছে, যারা এই ঝিল বা জলাশয়ের মধ্যে তাদের প্লট আছে বলে দাবি করছেন তারা তাদের প্রমাণপত্র সহ কে.এম.সি.–এর ট্রাইবুনালের কাছে আবেদন করুন। সেক্ষেত্রে কে.এম.সি. তাদের প্রতি সুবিচার করবেন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। অন্যথায় তারা জমি দালাল, জমি হাঙরদের খপ্পরে পড়ে বিপথগামী হবে।

সংস্কার মঞ্চের তরফে দাবি জানানো হয়েছে, আগামী দিনে ঝিলটির চারপাশ শালবল্লা দিয়ে বাঁধিয়ে, তার পাড় ধরে ছোটো বড়ো গাছ লাগানো হোক।

BOOK POST/REGISTERED JOURNAL
সংবাদমন্থন ৪ KHOBORER KAGOJ SAMBADMANTHAN (fortnightly) Vol 4 Issue 22 16 May 2013 Rs 2
Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

মজিলপুরে ধন্বন্তরি কালীর বেশের মেলা

সঞ্জয় ঘোষ, মজিলপুর, ১৫ মে, এবারের কালী বেশের ছবি প্রতিবেদকের তোলা •

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগরগামী আদি গঙ্গার ধারা বর্তমান মজিলপুর গ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হত। সেই সময় ভৈরবানন্দ নামে এক তান্ত্রিক সাধক ওই গঙ্গার ধারার মাঝে, বর্তমানে যেখানে মজিলপুরের ধন্বন্তরী কালী মন্দির, সেখানে একটি চরার ওপর সাধনা করতেন। একদিন তিনি স্বপ্নাদেশ পান পাশের পদ্মা পুকুরে আমি আছি, আমাকে উদ্ধার করে পুজো কর। মঙ্গল হবে। তিনি পুকুরে সন্ধান করে এক কোন থেকে একটি আট ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি কালো পাথরের কালী মূর্তি পান এবং একটি খড়ের চালার কুটিরে প্রত্যাদেশ মতো ওই মূর্তি পূজা করতে থাকেন।

ডায়মন্ডহারবার থানাভুক্ত ন্যাতরা গ্রামের রাজেন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি মজিলপুরে নিয়ে এসে তাঁকে এই কালী মূর্তি পূজার দায়িত্ব দিয়ে তিনি সাধনার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যান। রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মা কালী তাঁকে একটি বাতের ওষুধ দেন, যা পানের মধ্যে দিয়ে খেলে বাত সেরে যায়। ধন্বন্তরির মতো ওই ওষুধ কাজ দিত বলে সেই থেকে কালী বিগ্রহটি ধন্বন্তরি নামে পরিচিত হয়। নিত্য পূজা ছাড়াও প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে বিশেষ পূজা হয়। শত শত ভক্ত মায়ের পুকুরে স্নান করে রোগমুক্তির জন্য ওষুধ খায় ও পূজা দেয়। ক্রমে প্রায় দেড় শতাব্দী আগে পাকা মন্দির গড়ে ওঠে। আরও পরে সামনে একটি চাদনি আগত ভক্তদের বসার জন্য তৈরি হয়। এবং মঠের মতো মন্দিরের একটি চূড়া নির্মিত হয়। প্রায় শতাধিক বছর ওই আদি পাথরের মূর্তির অনুকরণে একটি কাঠের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হচ্ছে। প্রতি বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ওই কাষ্ঠ মূর্তিতে ১৬টি বিভিন্ন মাতৃদেবীর মূর্তির রূপদান করা হয়। এই রূপদানকেই স্থানীয়ভাবে বেশ বলা হয় আর এই উপলক্ষ্যে যে বিরাট মেলা হয় তাকে বেশের মেলা বলা হয়। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এই বেশ ও মেলা দেখতে ভিড় জমায়।

বাংলা ১৪২০ সনের ২৬ বৈশাখ থেকে দশ জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজি ১০ মে থেকে ২৫ মে) পর্যন্ত ষোলোটি বিভিন্ন বেশ–এ কালীকে সজ্জিত করা হবে। যেমন প্রথম দিন কুমারী, তারপরদিন মাতৃসাধনা, গণেশজননী, ভুবনেশ্বরী,

বিপত্তারিণী ইত্যাদি। সব শেষের অর্থাৎ ষোড়শ রূপটি তিনদিন থাকে। সেই সঙ্গে মেলার ভিড়ও ক্রমে সাংঘাতিক আকার নেয়। এর পরেও ভাঙা মেলা আরও কিছুদিন চলতে থাকে।

শান্তিপুরে রবি পুজো

বিশ্বজিৎ, শান্তিপুর, ১৫ মে •

শান্তিপুরে গত চার বছর ধরে রবীন পালের উদ্যোগে অভিনবভাবে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্রজয়ন্তী, রবিঠাকুরের পুজোর মাধ্যমে। রীতিমতো মূর্তি বসিয়ে, ঢাক বাজিয়ে, বাচ্চাদের করা কবিতা ও গানের মন্ত্রে। সকাল থেকে শুরু হয়ে রাত দশটা অবধি চলে এই পুজো। স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আসা হয় মণ্ডপে। তারা সকালে আঁকে। তারপর শুরু হয় একাধিক মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোথাও নাটক, কোথাও মূকাভিনয়।

কিন্তু পুজো কেন? উদ্যোক্তার রসিক উত্তর, সব ঠাকুরের পুজো হয়, তবে রবিঠাকুরের নয় কেন?

চার মেয়ের নবদ্বীপ–মায়াপুর ঘুরে আসা (পর্ব এক)

কাজরী রায়চৌধুরি, কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি •

কলকাতার নরম শীতের আমেজকে সঙ্গী করে আমরা চার বান্ধবী সন্ধ্যের ভাগীরথী এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। দিনটা ছিল ১৪ ডিসেম্বর। গন্তব্য কৃষ্ণনগর হয়ে মায়াপুর। আমাদের আসন সংরক্ষিতই ছিল। ফলে আড্ডা এবং আন্ডার সহবতে শুরুটা ভালোই হল। শুধু সামনে ক্লান্ত নিত্যযাত্রীদের দাঁড়িয়ে থাকাটা খানিক পীড়া দিচ্ছিল।

রাত ৮টা ২৫ মিনিটে কৃষ্ণনগরে নামলাম। সেদিন ছিল ঘোর অমাবস্যা। স্টেশনের বাইরে এক বন্ধু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঘন্টা দেড়েক পথ আমরা প্রায় বিদ্যুৎবাতিহীন অমানিশায় ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে ছুটে চললাম। সম্বল শুধু গাড়ির কুয়াশা ধূসর স্তিমিত আলো। চারিদিকে একটা গা ছমছমে অতিলৌকিক মায়ার রাজ্য যেন। চলেছি তো মায়াপুরেই। থাকব পূর্ব–নির্দিষ্ট ইসকনের অতিথিশালায়।

রাত সাড়ে দশটারও কিছু পরে বাইরের অন্নপূর্ণা হোটেলে খাওয়া সেরে ঢুকলাম আলোকিত অতিসজ্জিত ইসকনের সুদীর্ঘ পাঁচিল ঘেরা মায়াপুরে। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা আর নানারঙের গাঁদাফুলের যত্নশোভিত সমারোহ সেই রাত–বাতির আলোয় আমাদের সত্যিই মোহাচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। এই ফাঁকে বলে রাখি, দিনে ব্যস্ততা থাকায় আমরা সকালের কোনো ট্রেনে যেতে পারিনি। আর তাই মায়াপুরের সাথে আমাদের প্রথম দৃষ্টিপাত অমাবস্যা মাখা শীতকাতর ঘুমজড়ানো রাতে।

পরদিন সকাল ৯টায় চার সখী রওনা দিলাম নবদ্বীপের দিকে। ইসকনের ভেতরে তখন কীসের যেন তুমুল ব্যস্ততা। সাহেব–মেমরা বাঙালি পোশাক পরে হাতে জপের থলি নিয়ে কৃষ্ণনাম করতে করতে হেঁটে চলেছে মন্দিরের দিকে। প্রভাত আরতিতে। কারো সাথে মুখোমুখি হতেই মিষ্টি হেসে বলে উঠছেন, হরেকৃষ্ণ। প্রথমে মনে হল 'হ্যাপি ডে' শুনলাম। অচিরেই ভুল ভাঙল। মৃদু অস্ফুট থেকে তীব্র 'হরেকৃষ্ণ' ধ্বনিতে ইসকনের বাতাস বেশ সরগরম। ছোটো ছোটো সাহেব সন্তানেরা ধুতি–পাঞ্জাবি এবং ন্যাড়া মাথায় বড়ো একখানা টিকি সমেত সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়াপুরের গেট দিয়ে বেরিয়ে হাঁটা পথেই নদী। মাথা পিছু দেড়টাকা পারানি। বেশ লম্বা চওড়া বোট। নৌকার একপাশে আমরা, অর্থাৎ মানুষজন। মাঝে সাইকেলের সারি, অন্যপাশটায় অতি নিরীহ কয়েকটি মোষ। সবাই যাবে নবদ্বীপ। ষোড়শ শতাব্দীতে দুই বাংলাকে জাতপাতের বেড়া ডিঙিয়ে ভক্তি–আন্দোলনের জোয়ারে প্লাবিত করেছিলেন যিনি, সেই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান, বড়ো হওয়া, সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত নবদ্বীপ।

নেমে আমরা দুটো রিকশা নিলাম। প্রতি রিকশা ২০০ টাকা স্থির হল। দেখাবে রাধারানীর মন্দির, সোনার গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, রাধাগোবিন্দের মন্দির, গুপ্তবৃন্দাবন, পোড়ামাতলা। আমাদের উদ্দেশ্য ভক্তির ঘনঘটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ইতিহাসকে একটু চাক্ষুষ করা, কিন্তু প্রায় সবই এত চাকচিক্যময় যে সেই সময়ের ঘ্রাণ পাওয়া মুশকিল। তারই মধ্যে পরবর্তীকালে তৈরি রাধারানীর মন্দির সংলগ্ন একটি ছোটো ছোটো পোড়া ইঁটে গাঁথা ঘরের ভগ্নাবস্থা চোখে পড়ল। শুনলাম সেই ঘরে চৈতন্যদেব স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে বারো বছর সংসার করেছিলেন। আর সেই ছোট্ট এক চালা ঘর থেকেই তাঁর গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ। ঘরটা অযত্নে রক্ষিত, আগাছা এবং আবর্জনায় ভরা। অথচ দু–ফুট দূরত্বেই চক বাঁধানো বিশাল মন্দিরে অষ্টপ্রহর আরাধনা চলছে। প্রসাদ পাওয়ার আশায় তখন হতভাগ্য অনাথিনীর ভিড়।

রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরও শ্বেতপাথরে তৈরি পরবর্তীকালে স্থাপিত, মাথার ওপর কারুকার্য খচিত ঝাড়বাতি। চৈতন্যদেবের অতিসাধারণ জীর্ণ খড়মের সামনে এক জোড়া রূপোর পাদুকার ওপর ফুলের ভার, তার পাশের দেওয়ালে খোদাই করা ভাগবতের বাণী, যার মূল কথা, সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম যেখানে 'কাম গন্ধ নাহি তায়'। কিন্তু চৈতন্যদেব যেভাবে চন্ডীদাস–গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদন করতেন, যেভাবে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন এবং মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন, তার সাথে এ বাণী খাপ খায় না।

সমাজবাড়িও শ্বেতপাথরের তৈরি বিশাল নাটমন্দির। প্রায় আট ফুট উঁচু ও সেই অনুপাতে চওড়া একটা জালা রাখা আছে। গায়ে লম্বাটে অনেক ছিদ্র। ওটা প্রণামীর কুম্ভ। প্রতি সন্ধ্যায় নামগানের জন্য বড়ো চাতাল বাগানও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। নাটমন্দিরেও তখন প্রসাদের লম্বা লাইন। বহু বয়স্ক অনাথ–অনাথিনীর জীবনের শেষ আশ্রয় এই মঠ মন্দিরগুলো। পাঁচিলের বাইরে বেশ কতগুলো দোকানে পুজোর উপাচার বিক্রি হচ্ছে। তার মধ্যে নানা মাপের তুলসি দানার মালা অর্থাৎ কন্ঠী ঝুলছে। হস্তশিল্পের নমুনা ও নবদ্বীপের স্মৃতি। কিনে ফেললাম চারখানা। চার বন্ধু গলায় পরতেই অমোঘ ধ্বনিটি বেরিয়ে এল — হরেকৃষ্ণ। এর পরের গন্তব্য পোড়া মা তলা। রিকশার পথ সংকীর্ণ। নবদ্বীপকে কল্পনা করেছিলাম গ্রামবাংলার শেষ রেশটুকুর মধ্যেই, অথচ ইতস্তত পরিকল্পনাহীন গজিয়ে ওঠা দোকান, বাজার, ফ্ল্যাটবাড়ি মনটাকে দমিয়ে দিচ্ছিল। মোবাইলের দোকান, তার পাশে কম্পিউটারের পার্টস বিক্রি, বাইক সারানোর গ্যারেজ। রিকশা থামল টেলিফোন বুথ ও সুলভ শৌচালয়ের গা ঘেঁষে একটা বাজারের সামনে। বিক্রি হচ্ছে পুজোর ফুল মালা শাঁখা পলা সিঁদুর আলতা বাতাসা কদমা এবং খেলনাপত্র। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক ঝুপড়ি দোকান পোড়ামাতলার প্রাঙ্গণকে ঢেকে ব্যবসা করছে। একটা বুড়ো বড়ো গাছ, বয়স হবে পাঁচশো বা তারও বেশি। তার ঝুরি থেকে আবার কাণ্ড গজিয়ে দশফুটের মধ্যেই আরও শাখা–প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে শাখাবট। আকাশের দিকে তাকালে বিরাট একটা প্রান্তর জুড়ে শুধু বটপাতার জাফরি চোখে পড়ে। সেই গাছ দুটির প্রধান কাণ্ডের কোটর ছোটোখাটো মন্দিরের গর্ভগৃহের মতোই প্রশস্ত। ভেতরে কালীমূর্তি। কোটরের মুখে গ্রিলের গেট লাগানো। পেছনে একটি বহু পুরোনো মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। আর শাখা বটটির কাণ্ড আগুনে পুড়ে কালো মূর্তির আকার ধারণ করেছে। সেখানেই পুজোর বেশি ধুম। ভক্তদের কেনাকাটা–হুড়োহুড়ি, পুরোহিতের হাঁকডাক, ভিখারিদের কাকুতিতে অমন প্রাকৃতিক এবং ঐতিহ্যবাহী জায়গাটা কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন ও ভক্তকুলের যৌথ আগ্রাসন অতীতের মাটির গন্ধকে মুছে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে যেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এবার ফিরে চললাম নবদ্বীপ নদীর ঘাটের দিকে। কিন্তু চৈতন্যদেবের জন্মভিটে তো দেখা হল না! আবছা স্মৃতিতে ছিল নিমগাছ, পুকুরঘাট আর কুঁড়েঘর — বইয়ে পড়া। চালকদের বলতেই তারা বলল যে ওটা প্রাচীন নবদ্বীপ। ওখানে দেখার কিছুই নেই। কেউ যায় না। সবাই একটাই দেখে, পুজো দেয়। আমরা জেদ ধরলাম, ওখানেই যাব। এই চালকরা সেই 'পশ্চিমপ্রান্তে' যেতে রাজি হল না। তাই আমরা নদীর ঘাটে নেমে অন্য দুটো রিকশা ধরলাম। দুপুর ১টা থেকে ৩টে মন্দির বন্ধ থাকবে। তবে ভিটে দেখা যাবে। তাই সই। আমরা আবার নতুন উদ্যমে ভিটের টানে রিকশায় চড়ে বসলাম। *ক্রমশ*

খ ব রে দু নি য়া

ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিতে হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডব

কুশল বসু, কলকাতা, ১১ মে। বাংলাদেশের অনলাইন কর্মীদের নেটওয়র্কের সৌজন্যে পাওয়া ছবিতে, রাতে নিরাপত্তা বাহিনীর তাড়া খেয়ে শাপলা চত্বর থেকে চলে যাচ্ছে হেফাজতের কর্মীরা, অর্থাৎ বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। অনেকেই ওই গরমে সমাবেশে যোগ দিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে •

সাভারে সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিকদের গণমৃত্যু তাদের থমকাতে পারেনি একফোঁটাও। বাংলাদেশে ধর্মীয় শাসনের প্রবক্তাদের নয়া কিসিমের সংগঠন হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচিকে ঘিরে আবার অশান্ত হল গোটা বাংলাদেশ। এর আগে এই সংগঠনটি এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা পর্যন্ত 'লং মার্চ' কর্মসূচি নিয়েছিল। তাতে সারা দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ছাত্রদের ওপর নির্দেশ জারি করে ও উসকিয়ে ঢাকা নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়েছিল। সরকার থেকে দূরপাল্লার সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হলেও কয়েক লক্ষ লোক জোগাড় করে ঢাকার রাস্তা দখল করেছিল হেফাজত, সরকারের কাছে দিয়েছিল ১৩ দফা দাবিসনদ। সেই ১৩ দফা দাবিসনদ বাংলাদেশের ইসলামি শাসন কায়েম থেকে শুরু করে প্রকাশ্যে ছেলে–মেয়ের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করা, ঢাকা শহরের ভাস্কর্য্য স্থাপন না করা, নারী নীতি বাতিল করা, ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতায় লাগাম, বাধ্যতামূলক ধর্ম শিক্ষা, ইসলাম অবমাননার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি দাবি জানানো হয়।

এই ১৩ দফা দাবি নিয়ে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ছিল ৫ মে। জামাতে ইসলামি ও বিএনপি খোলাখুলি হেফাজতের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এমনকী বিএনপি–র পক্ষ থেকে সরকার পতনের জন্য ৪৮ ঘন্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়।

যাই হোক, হেফাজতের কর্মসূচি শুরু হয় সকালে ফজরের নামাজ শেষ হতে না হতেই। গাড়ির ওপর মাইক খাটিয়ে সমাবেশ শুরু হয়ে যায় আবদুল্লাপুর, যাত্রাবাড়ি, বাবুবাজার পোস্তগোলা, নারায়ণগঞ্জ এবং সাভারের আমিনবাজার এলাকায়। যাত্রাবাড়ি এবং ডেমরা–তে পিকেটিং করে চট্টগ্রাম এবং সিলেটকে ঢাকা থেকে আলাদা করে দেয় তারা। মাইকে বারবার ১৩ দফা দাবি বলা হয়।

গোটা ঢাকাকে আশেপাশের এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চালাতে শুরু করে হেফাজত কর্মীরা। নয়াবাজার এবং আমিনবাজার এলাকায় পুলিশ হেফাজতের অবরোধকে কিছুটা প্রতিরোধ করছিল। ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারামের মধ্যে দুটি মোটর সাইকেলে আগুন দেয় হেফাজতের কর্মীরা, আশেপাশের বইয়ের দোকানগুলি পোড়ায়, জুয়েলারি ও ইলেকট্রনিক্সের দোকানগুলি লুঠ হয়। সকাল এগারোটার সময় হেফাজতের কর্মীদের মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সভা করার অনুমতি দেয় সরকার। উল্লেখ্য, আওয়ামি লিগের পরিচালনাধীন সরকার হেফাজতের প্রতি বেশ নরম। এর আগে হেফাজতে ১৩ দফা দাবিসনদ দিয়ে লং মার্চ করার পরপরই হেফাজতের দাবি মেনে কয়েকজন ব্লগারকে জেলে পোরে হাসিনা সরকার। গত শুক্রবার শেখ হাসিনা হেফাজতের নেতাকর্মীদের বার্তা দেন, তাদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। তারা যেন সমাবেশ প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু হেফাজতে তাতে বিন্দুমাত্র না দমে গিয়ে ঢাকা অবরোধের কর্মসূচি বহাল রাখে। যদিও হেফাজতের প্রধান আল্লামা শফি নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে অবরোধে যোগ দেননি।

সারাদিন গোটা ঢাকা জুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে, গাড়ি জ্বালিয়ে, বাড়ি পুড়িয়ে, ভাঙচুর করে, পুলিশের দিকে ককটেল আর বোমা ছুড়ে, দোকানপাট লুটপাট করে সন্ধ্যেবেলা মতিঝিলে সমাবেশ শুরু করার পর হেফাজত ঘোষণা করে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা শাপলা চত্বর থেকে নড়বে না। রাত আড়াইটে নাগাদ দশ মিনিটের অভিযান চালিয়ে পুলিশ ও র‍্যাবের মিলিত বাহিনী হেফাজতে কর্মীদের ঢাকা থেকে বাইরে বের করে দেয়। এই অভিযান চলাকালীন কাঁদানে গ্যাস বা লাঠি ছাড়াও গুলিও চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। উপস্থিত সাংবাদিকদের হিসেব অনুযায়ী, রাতে সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় শাপলা চত্বর থেকে। সারা দিন হেফাজতের তাণ্ডবের সময় তিনজন মৃত্যুর খবর আসে, তার মধ্যে একজন পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর।

ভোর পাঁচটায় শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চও ভেঙে দেয় পুলিশ, যদিও সেখানে কোনও হিংসার চিহ্ন ছিল না। মঞ্চ থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়নি। পরদিন রাত বারোটা পর্যন্ত ঢাকায় সভা সমিতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার। এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নেয় গণজাগরণ মঞ্চ।

৯ মে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়েত নেতা কামরুজ্জামানের ফাঁসির রায় দেয় আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। তার আগের দিন থেকে ফের শাহবাগ চত্বরে ফিরে এসে ধর্ণায় বসে শাহবাগীরা। আটক পাঁচ ব্লগারের মধ্যে তিনজন জামিন পেয়েছে।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল
: manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.